নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ৬, পৃ : ১- ১৮
©২০০১ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

# বাংলাদেশে নৃবিজ্ঞান চর্চায় সাম্প্রতিক বিতর্কঃ কিছু জিজ্ঞাসা ও উত্তর খোঁজার প্রয়াস

এস, এম, নুরুল আলম*

## ভূমিকা ঃ কেন এই লেখা?

নৃবিজ্ঞানের জ্ঞান দর্শন ও পাঠ্যসূচী বিষয়ে ইদানীং বেশ তর্কের সূচনা হয়েছে। অতি সম্প্রতি অনুষ্ঠিত (৬.২.৯৯) নৃবিজ্ঞান নিয়ে মুক্ত আলোচনার দিন ব্যাপী সেমিনারে এই তর্ক বিতর্ক যথেষ্ট আলোড়ন তৈরী করে।[১] আমার মনে চিন্তার উদ্রেক করে, নৃবিজ্ঞান কি? আমরা শিক্ষক ও শিক্ষার্থী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং নানান ভাবে একে দেখছি কি? আমরা কি 'ধরনের' নৃবিজ্ঞান নিয়ে এগুলো বলে ভাবছি। প্রয়াস নিচ্ছি। 'এক নৃবিজ্ঞান' বলে আদৌ কোথাও কিছু আছে কি? এই জ্ঞানকান্ডের প্রকৃতি নির্ধারণ দ্বারাও এর লক্ষ্য নির্বাচনে কি মতাদর্শ কাজ করছে? কার জন্য করছে? এসব নিয়ে ভাবনার প্রেক্ষাপটেই আমার এই লেখা। সমাজ বিজ্ঞান জ্ঞানকান্ডে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বির্তক স্বাভাবিক এবং এটা নতুন কিছু নয়। যে কোন জ্ঞানকান্ড বিকাশের অন্যতম শর্ত হচ্ছে মুক্ত আলোচনা, বিতর্কের পরিসর বিস্তৃত করা। অতএব আমার অভিমত সকলের মত হবে না জেনেও আমার এই প্রয়াস।

## বিতর্কের মূল বিষয়সমূহ

তা,হলে বির্তকের কেন্দ্রীয় বক্তব্যগুলো কি? বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে প্রথমেই বক্তব্যগুলোকে সংক্ষেপে নিম্নে বলার চেষ্টা করছি। মোটা মুটিভাবে বক্তব্যগুলোকে কয়েকটি ভাগে দেখা যেতে পারে।

**দ্বিতীয়তঃ** বিতর্কের আরেকটি বিষয় হল উপনিবেশবাদের সাথে নৃবিজ্ঞানের সম্পর্ক। গফের উক্তিটি উদ্ধৃত করে বলা হয় "নৃবিজ্ঞান সাম্রাজ্যবাদের শিশু"। তবে এই সম্পর্কের ইতিহাস, প্রেক্ষিত ও বর্তমান সময়ে এই সম্পর্কের ধরন ও ব্যপ্তির বিষয়ে সতর্ক উপস্থাপনার প্রয়োজন আছে কিনা এনিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়।

---

* শিক্ষক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

**তৃতীয়ঃ** কারও কারও মতে সকল নৃবৈজ্ঞানিক কাজেই তত্ত্ব জরুরী গবেষণা, বর্ণনা বা লেখায় তত্ত্ব আবশ্যকীয় শর্ত কিনা এটা নিয়ে ভাবনার অবকাশ রয়েছে। যদি তত্ত্বের কথা আসে তা'হলে কোন তত্ত্ব?

**চতুর্থতঃ** "নির্মাণ" ও 'বিনির্মাণ" বিষয়টি নিয়ে বিতর্কের সূচনা হয়েছে। তবে স্পষ্ট নয় কোনটা নির্মাণ বা বিনির্মাণ, স্পষ্ট নয় এ থেকে আমরা কি নির্মাণ করছি। তা'হলে নৃবৈজ্ঞানিক জ্ঞান চর্চায় এ বিতর্কের অবদান কি? বিতর্কের প্রয়োজনকে স্বীকার করেই প্রশ্ন রাখা যায় এর শেষ কোথায়?

সর্বশেষে আমি মনে করি কিছুই রাজনীতি-বিযুক্ত নয়, তবে অতি রাজনৈতিক মনস্কতা এবং অন্যের উপর তার প্রতিফলন ঘটানোর প্রয়াস নৃবিজ্ঞান চর্চায় এর ব্যাপকতাকে সীমিত করে দেবে কি?

বাংলাদেশে নৃবিজ্ঞান নিয়ে চিন্তা ভাবনায় যে বিষয়গুলোকে বিতর্কমূলক এবং আরও ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়েছে তাই সংক্ষেপে উপরে বিধৃত করলাম। প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে উপরোক্ত কিছু বিষয়কে আরও বিস্তারিত আলোচনার প্রয়াস চালিয়েছি।

### নৃবিজ্ঞানের পাঠ্যসূচী

বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে আলাদা বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠানিকভাবে নৃবিজ্ঞান চর্চা শুরু হয় ১৯৮৬ সালের শেষ দিক থেকে যখন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃবিজ্ঞান বিভাগটি খোলা হয়। যদিও বর্তমানে আরও ৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ণাঙ্গ নৃবিজ্ঞান বিভাগ রয়েছে, কিন্তু এটা বলার অপেক্ষা রাখে না বাংলাদেশে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ই প্রথম সমাজ বিজ্ঞানের অন্যতম বিষয় হিসেবে নৃবিজ্ঞানের গুরুত্ব অনুধাবন করে। তাই বলা যায় এ বিভাগটি এদেশে নৃবিজ্ঞান চর্চার পথিকৃত।

জাহাঙ্গীরনগরে যখন নৃবিজ্ঞান বিভাগ খোলার সিদ্ধান্ত নেয়া হয় তখন একটি কার্যকরী ও সময়োপযোগী পাঠ্যসূচী তৈরী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। প্রকৃতপক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে যে কোন নতুন বিষয়ে বিভাগ খোলা সময়োপযোগী পাঠ্যসূচী তৈরী একটি পূর্ব শর্ত ও বটে। আমি এখানে পাঠ্যসূচীর তৈরীতে যে বিষয়টি উপর গুরুত্ব দিতে যাচ্ছি তা হল সময়োপযোগীতা। এ দিয়ে আমি কি বুঝাতে চাচ্ছি তা পরে আলোচনা করব। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পাঠ্যসূচী যা ১৯৮৬-৮৭ শিক্ষাবর্ষের জন্য তৈরী করা হয়েছিলো, সেখানে

ঘটানো হয়েছিল তত্ত্ব, পদ্ধতি, এথ্নোগ্রাফি এবং কিছু বিশেষায়িত কোর্স যেমন, কৃষি কাঠামো, কৃষক সমাজ, র‍্যাডিকেল নৃবিজ্ঞান এবং প্রাক-পুঁজিবাদী সমাজ। পরবর্তীতে পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জনা' ও সংযোজনের মাধ্যমে পাঠ্যসূচীতে পরিবর্তন আনা হয়।

এই পরিবর্তনে যে বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় আনা হয় তা হল বিভিন্ন কোর্সের মধ্যে আন্ত-সম্পর্ক। প্রথম পাঠ্যসূচীতে বেশ কয়েকটি কোর্স ছিল যাতে অনেক পুণরাবৃত্তি ছিল। পাঠ্যসূচী তৈরীর প্রথম অবস্থায় তা বুঝা সম্ভব হয়নি। কারণ একটি নতুন বিষয়ে পাঠ্যসূচী তৈরীর কাজটি ছিল অত্যন্ত দুরুহ। তবে শুরুর সময়ে পাঠ্যসূচী তৈরীতে যারা নিয়োজিত ছিলেন তারা অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যও অত্যন্ত সুন্দর ও সূচারুভাবে কাজটি করেছিলেন এবং তাদের অবদান প্রশংসার দাবীদার।[২]

প্রথম কয়েক বৎসর পাঠ্যসূচী অনুসরণ করে নৃবিজ্ঞান পড়াতে গিয়ে শিক্ষকরা অনুধাবন করলেন যে বেশ কিছু কিছু কোর্সের বিষয়গুলোকে সমন্বয় করে কোর্সগুলোকে আরও সুন্দর করা যায়। তাই পরবর্তীতে কিছু কিছু কোর্স যেমন, কৃষি কাঠামো, প্রাক-পুঁজিবাদী সমাজ, বিশ্বাস ও মূল্যবোধ, সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি কোর্সগুলোকে বাদ দেয়া হয়। অনেক ক্ষেত্রে এই সকল কোর্সের কিছু অংশে অন্য কোর্স গুলোতে সরিয়ে নেয়া হয়। এটা করা হয় নতুন কিছু কোর্সকে জায়গা করে দেয়ার জন্যে। সমসাময়িক নৃবিজ্ঞানের ব্যাপ্তি ও প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে বিভিন্ন পর্যায়ে পাঠ্যসূচীতে কিছু নতুন কোর্সও সংযোজন করা হয়। এগুলোর মধ্যে ছিল চিকিৎসা নৃবিজ্ঞান, পরিবেশ, সংস্কৃতি ও সমাজ, নগর নৃবিজ্ঞান এবং সমাজ ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তন। এই সকল কোর্সগুলো স্পষ্টতই ইস্যু কেন্দ্রিক যুগপোযোগী ও সমসাময়িক নৃবিজ্ঞানের প্রয়োজন মেটাবে বলে মনে করা হয়েছে। এই সাথে তত্ত্বের কোর্সগুলোকেও বিষয়বস্তু ও ব্যপ্তিতে আরও শক্তিশালী করা হয়। তা'ছাড়া বিভিন্ন পর্যায়ে আরও কিছু নতুন কোর্স যেমন, দক্ষিণ এশিয়া অধ্যয়ন, আধুনিক সমাজ চিন্তার স্থপতি ও রাজনৈতিক আন্দোলন ও যৌথ সত্তা শিরোনামে বেশ কিছু কোর্স পাঠ্যসূচীতে অন্তৃভুক্ত করা হয়।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞানের পাঠ্যসূচীতে এই পরিবর্তন নিয়ে সম্প্রতি কেউ কেউ হতাশা প্রকাশ করে মন্তব্য করেছেন, "কিছু দুর্দান্ত কোর্স বাদ গেল," "বাজারী" বা "বাজারমুখী" কোর্স চালু হয়ে গেল। জাহাঙ্গীরনগরে কোর্সের পরিবর্তনকে মূল্যায়ন করা হল এভাবেই, "এসব পরিবর্তন হতে বলা যায় প্রতিষ্ঠার

পরবর্তী দশ-বারো বছরে জাহাঙ্গীরগরের পাঠ্যক্রম যেন তত্ত্ব ঘনিষ্ঠাতার চাইতে কিছুটা ইস্যু কেন্দ্রিক, চাহিদামুখী নতুন লক্ষ্যের দিকে এগিয়েছিলো।" (সুলতানা ও ফেরদৌস, ১৯৯৯, পৃঃ ২) জাহাঙ্গীরনগরের বাইরে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান পাঠ্যসূচী সম্পর্কেও বলা হল, "শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালযের প্রথম স্নাতক পর্যায়ের পাঠ্যক্রমে নৃবিজ্ঞানের কোর্স চাহিদামুখী, বাজারী কোর্স ছিল না, পরে একটা দু'টা ঢুকেছে। অথচ সেখানেই স্নাতকোত্তর পযায়ে ফলিত নৃবিজ্ঞানের বেশ কয়েকটি কোর্স শক্তপোক্ত জায়গা করে নিয়েছে।" (পূর্বোক্ত পৃঃ ৬) উপরোক্ত প্রবন্ধে যে সকল কথা বলা হয়েছে তা একপেশে এবং বিধৃত ভাষাকে আমার কাছে গ্রহনযোগ্য মনে হয়নি।[৩]

### পাঠ্যসূচী কি হওয়া উচিত?

আমি মনে করি একটি সমসাময়িক নৃবিজ্ঞান পাঠ্যসূচীতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো থাকা জরুরীঃ

১. নৃবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ঃ যেখানে থাকবে জ্ঞানকান্ড হিসেবে নৃবিজ্ঞানের জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত তত্ত্বের বিস্তার ও তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা। এখানে জোর দিতে হবে এবং প্রশ্ন উত্থাপন করতে হবে কারা, কিভাবে, কখন এবং কোন প্রেক্ষিতে এ তত্ত্ব নির্মাণ করেছেন।

২. নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণা পদ্ধতি ঃ এখানে গুরুত্ব পাবে নৃবৈজ্ঞানিক বিভিন্ন গবেষণা পদ্ধতি যা সমাজ বিজ্ঞানের অন্যান্য জ্ঞানকান্ডের গবেষণা পদ্ধতির সাথে সম্পৃক্ত করে আলোচিত হবে। গুণগত এবং পরিমানগত পদ্ধতিতে বিভাজন না করে এদুটো পদ্ধতি পরিপূরক হিসেবে পাঠ্যসূচীতে অর্ন্তভূক্ত হতে পারে, সাথে সাথে নৃবৈজ্ঞানিক মাঠকর্মের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যের উপস্থাপনে কম্পিউটারের ব্যবহারকে ও উৎসাহিত করা হবে।

৩. নৃবিজ্ঞানে কিছু কেন্দ্রীয় বিষয়াবলী ঃ কেন্দ্রীয় বিষয়বলী বলতে বুঝান হচ্ছে, নৃবিজ্ঞান অধ্যয়নে সব সময় কিছু বিষয় যেমন, কৃষক সমাজ, জ্ঞাতি সম্পর্ক, কৃষি কাঠামো, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নৃবিজ্ঞান, ধর্ম ও বিশ্বাস, এথনোগ্রাফি ইত্যাদি বিষয়গুলো প্রাধ্যান্য পেয়েছে। এগুলোকে নিয়ে পাঠ্যসূচীতে কিছু কোর্স অবশ্যই থাকবে।

৪. সমসাময়িক বিষয়ভিত্তিক কোর্স ঃ নৃবিজ্ঞান পাঠ্যসূচীতে কিছু সমসাময়িক বিষয়ের উপর যেমন, বিশ্বায়ন, সিভিল সমাজ, এনজিও, মৌলবাদ, অস্ত্র প্রতিযোগীতা, ইত্যাদি বিষয়গুলোকে ফোকাস করেও কোর্স তৈরী করা যায়। তবে

এই প্রয়াসে অবশ্যই জোর থাকবে নৃবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা ও পর্যালোচনা। অর্থাৎ নৃবৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সাথে ছাত্রছাত্রীরা যাতে এ বিষয়গুলোকে সম্পর্কিত করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

৫. ফলিত নৃবিজ্ঞান ঃ ইস্যু ভিত্তিক বিষয়গুলোকে আবার ফলিত নৃবিজ্ঞানের আওতাধীন করে দেখা যায়। তবে সম্প্রতি ফলিত নৃবিজ্ঞানকে নৃবিজ্ঞানের পঞ্চম উপবিভাগ হিসেবে দেখা হয়।[৪] বহু নতুন নতুন বিষয় যা আমাদের জীবনকে বিভিন্ন ভাবে প্রভাবিত করছে তাই আজ ফলিত নৃবিজ্ঞানের প্রধান ফোকাস। ফলিত নৃবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়বস্তু হল পরিবেশ, স্বাস্থ্য, উন্নয়ন, লিঙ্গ এবং আরও বহু বিষয়। তাই ফলিত নৃবিজ্ঞানের বিষয়গুলো নৃবিজ্ঞানের পাঠ্যসূচীতে থাকা বাঞ্ছনীয়। এ কোর্সগুলোর উপস্থিতি যে কোন পাঠ্যসূচীতে সমৃদ্ধ করবে।

**জাহাঙ্গীরনগরের পাঠ্যসূচী কিভাবে মূল্যায়িত হবে?**

উপরের কাঠামোর আলোকে আমি খুব সংক্ষিপ্তভাবে জাহাঙ্গীরগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী সম্পর্কে কিছু বলব। প্রথমতঃ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যসূচীতে প্রথম থেকে চতুর্থ বৎসর পর্যন্ত রয়েছে ৪টি সমৃদ্ধ তত্ত্বের কোর্স যেখানে নৃবৈজ্ঞানিক জ্ঞানকান্ডের শুরু থেকে অধুনা নৃবিজ্ঞানের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত অনেক সমাজ বিজ্ঞানের তত্ত্বকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং গুরুত্ব সহকারে পড়ানো হয়। তাছাড়া লিঙ্গ, উন্নয়ন, জ্ঞাতি সম্পর্ক ইত্যাদি কোর্স গুলোতেও অনেক তত্ত্বকে সম্পৃক্ত ও সম্পর্কিত করে আলোচনা করা হয়। দ্বিতীয়তঃ গবেষণা পদ্ধতির আলোচনা এবং পরবর্তীতে মাঠকর্ম পাঠ্যসূচীর একটি উল্লেখযোগ্য দিক। তৃতীয়তঃ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে রয়েছে বেশ কিছু ইস্যু কেন্দ্রীক কোর্সের অর্ন্তভুক্তি যা পাঠ্যসূচীকে কেবল সমসাময়িক করেনি বরং সমৃদ্ধ করেছে। স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ফলিত নৃবিজ্ঞানে দ্বিতীয় একটি ধারা চালু করা হয়েছে। এই ধারায় গুরুত্ব দেয়া হয়েছে চিকিৎসা ও পরিবেশ নৃবিজ্ঞানের উপর। এসব বিবেচনা করে আমি বলব জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালযের নৃবিজ্ঞানের পাঠ্যসূচী অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও সময়োপযোগী এবং গতিশীল। দেশে ও বিদেশে যারা এটি দেখেছেন (অন্ততঃ যাদের সাথে আমার কথা হয়েছে) তারা এটিকে উন্নত মানের প্রয়োজনীয় পাঠ্যসূচী বলেই আখ্যায়িত করেছেন।[৫]

**সমস্যা কার এবং কোথায়?**

তা'হলে সমস্যা কোথায়? কেন বলা হচ্ছে "বাজারী" বা "চাহিদামুখী" বা "তত্ত্ব ঘনিষ্ঠহীন" কোর্স? প্রশ্ন তোলা যায় কেন এ ধরনের বক্তব্য?

এ প্রশ্নগুলোর উত্তর খোজা খুব কঠিন নয়। আমরা যখন বিভিন্ন রিটোরিকেল কথা বলি তখন ভুলে যাই আমরা কোন অবস্থান থেকে বলছি, কেন বলছি এবং কার জন্যে বলছি? আরও ভুলে যাই আমাদের অতীত ও বর্তমান অবস্থা ও অবস্থান। সরলভাবে বলা যায়, আমরা যারা বিভিন্নভাবে প্রতিষ্ঠিত, নিরাপদ ও নিশ্চিত পেশাগত অবস্থানে আছি যেমন ধরুন শিক্ষকতায়, তারা সমাজের কতিপয় ভাগ্যবানেরই একজন। এদেশের কয়জন ব্যক্তি যোগ্যতা সত্তেও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে পারেন? কারণ সুযোগ সীমিত। কিংবা ধরুন ক'জন সাংবাদিক হতে পারে কিংবা স্বাধীনভাবে বুদ্ধিভিত্তিক কাজ চালিয়ে যেতে পারে। তা'হলে নিশ্চয়ই স্বীকার করে নিতে হয় আমরা শিক্ষকরা অত্যন্ত ভাগ্যবান। আরও ভাবুন আমরা যা বলতে পারি বা আমাদের পক্ষে যা করা সম্ভব তা সকলের পক্ষে করা সম্ভব কিনা। আমরা কেন ধরে নিচ্ছি আমাদের সকল শিক্ষার্থীই শিক্ষক হবেন, 'বাজারী' বা 'চাহিদামুখী' নৃবিজ্ঞানের বিপরীত বা বিকল্প কোন নৃবিজ্ঞানের চর্চার কথা বলবেন কিংবা চর্চা করবেন। এক্ষেত্রে স্পষ্ট করার প্রয়োজন আছে শিক্ষার্থীদের প্রতি শিক্ষকদের দায়িত্ব কি?

জাহাঙ্গীরনগরে পাঠ্যসূচীতে সাম্প্রতিককালের পরিবর্তন ও পরিবর্তনের উদ্যোগ বাংলাদেশে নৃবিজ্ঞান চর্চাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং শিক্ষার্থীদের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকেই করা হয়েছে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। আমাদের প্রতিনিয়তই ভাবা উচিত কিভাবে পাঠ্যসূচীকে আরও প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক করা যায়। যে বিষয়গুলো পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা হল তা কতটুকু প্রাসঙ্গিক তা স্পষ্ট করতে হবে। এটাই হল প্রাসঙ্গিকতা (search for relevance) খোঁজা।[৬] এখানে মনে রাখা প্রয়োজন কোন পাঠ্যসূচীই স্থায়ী নয়। একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজন করেই একটি শিক্ষাকার্যক্রম এগিয়ে চলে। কিছু 'দুর্দান্ত' বা 'দারুন কোর্স', বাদ পড়ল তা খুবই একপেশে এবং মূল্যবোধ তাড়িত মন্তব্য। ছাত্রছাত্রীদের কথা বিবেচনা করে নৃবিজ্ঞানকে প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজন ধর্মী করে তোলার সার্বক্ষণিক প্রয়াসই হওয়া উচিত।

পাঠ্যসূচীতে পরিবর্তন ও কিছু সংযোজনকেই "চাহিদামুখী নৃবিজ্ঞান" "বাজারী কোর্স" চালু হয়ে গেল বলে মন্তব্য করা হচ্ছে। আমি বুঝিনা "চাহিদা বা"বাজার" বিষয়টি এত সংবেদনশীলভাবে দেখা হচ্ছে কেন? আমরাতো সবাই বাজার ব্যবস্থারই অংশ এবং প্রতিনিয়ত বাজারের মাধ্যমেই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছি। আমরাও আবার বাজারের চরিত্র নির্ধারণ করি। তা'হলে কি বাজারকে বর্জন করে ঘরে বসে থাকব নাকি বাজারে নিজ অবস্থানের জন্যে দেন-দরবার করার যোগ্যতা সম্পন্ন নৃবিজ্ঞানী তৈরী করব? রিটোরিকেল হয়ে কিছু পপুলার উক্তি করা আর বাস্তবতার

মুখোমুখী হওয়া এক নয়। আমাদের বাস্তবতা হচ্ছে বেঁচে থাকার জন্যে সংগ্রাম, বেকারত্ব ঘুচানোর সংগ্রাম এবং একটি চাকুরীর জন্যে প্রতিযোগীতা বা লড়াই। এই বাস্তবতার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নৃবিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের যথাযথ প্রস্তুত করার প্রয়াসই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীর একটি উদ্দেশ্য তবে একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। আমি দেখছি স্নাতকোত্তর পরীক্ষা দেয়ার পরই কি অসহায় হয়ে পরে ছাত্রছাত্রীরা। কোথায় যাবে, কি করবে এবং কি আছে ভবিষ্যতে এই চিন্তাই তাদের তাড়িত করে। হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে শিক্ষার্থীরা। এ অবস্থা সমাজ বিজ্ঞানের যে কোন জ্ঞানকান্ডের বেলাতেই সত্য। এখানে আমাদের করণীয় হল, শিক্ষার্থীদের এমনভাবে প্রশিক্ষিত করা যাতে ওরা সমাজ বিজ্ঞানের অন্যান্য জ্ঞানকান্ডে প্রশিক্ষিত শিক্ষার্থীর সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারে।[৭] তা'নাহলে নৃবিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৃষ্টি হবে হতাশা, নৃবিজ্ঞান সম্পর্কে অনাগ্রহ এবং নৃবিজ্ঞান হয়ে যাবে অপ্রয়োজনীয়। এখানে উল্লেখ করতে চাই যে, নৃবিজ্ঞানে প্রতিনিয়ত যে নতুন নতুন বিষয় সংযোজিত হচ্ছে তা' হচ্ছে মূলত নৃবিজ্ঞানকে প্রয়োজনীয়, প্রাসঙ্গিক ও যুগোপযোগী করে তোলার প্রয়াসেই।[৮] বৃটিশ নৃবিজ্ঞানী Scarlet Epstein (১৯৮৫) এর নিম্নোক্ত উক্তিটি এখানে আমার কাছে খুবই অর্থবহ মনে হয়েছেঃ

"যদি বৃটিশ একাডেমিক নৃবিজ্ঞানীরা সনাতনী জ্ঞানকান্ডের সীমানা রক্ষার্থে বেশী জেদ করেন এবং পরিকল্পনা ও অন্যান্য সংশিষ্ট বিষয়গুলোকে বিশুদ্ধ নৃবিজ্ঞান বহির্ভূত মনে করেন, তা'হলে এটা ভবিষ্যদ্বানী করা সহজ যে, আগামী ২৫ বৎসরের মধ্যে নৃবিজ্ঞানের অবস্থা কিছু প্রান্তিক বিষয় যেমন, ধর্ম অধ্যয়নের মত হবে। এই বিষয়গুলো আজকাল খুবই সীমিত সংখ্যক ছাত্রছাত্রী পড়ে থাকে এবং যেখানে শিক্ষাদানে খুবই স্বল্প সংখ্যক শিক্ষকের প্রয়োজন।" (পৃঃ১৮৮)।

বৃটিশ নৃবিজ্ঞান সম্পর্কে Epstein এই উক্তিটি করেছিলেন ১৯৮৫ সালে। এখানে হয়ত বলার অপেক্ষা রাখেনা যে সূচনাকালে বৃটিশ নৃবিজ্ঞান ছিল খুবই বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীক এবং মনে করা হত যে, ফলিত নৃবিজ্ঞান হল "নিম্ন-মানের নৃবিজ্ঞান" এবং যারা এটি চর্চা করেন তারা "প্রথম সারির নৃবিজ্ঞানী" নন। বৃটিশ নৃবিজ্ঞানের প্রেক্ষিতে Epstein এর এই উক্তিটির পটভূমি ছিল বৃটেনের সমকালীন নৃবিজ্ঞান এবং একাডেমিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে চাকুরীর সুযোগ। সেই সময়ে বৃটেনে বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নৃবিজ্ঞান চর্চার সুযোগ সীমিত হয়ে আসছিল। তাই বিশ্ববিদ্যালযের বাইরে সুযোগ তৈরী জরুরী হয়ে প্রাসঙ্গিকতা কতটুকু কিংবা এর সাথে সম্পর্কিত আরেকটি প্রশ্ন বাংলাদেশ নৃবিজ্ঞান চর্চার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা কি?

**বাংলাদেশে নৃবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য ঃ কিছু প্রস্তাব**

এ বিষয়ে আমার অবস্থান এই প্রবন্ধে পূর্বে কিছু বলার চেষ্টা করেছি। তবে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে বক্তব্যটি আরও স্পষ্ট করার প্রয়োজন আছে। আমি আজ থেকে ১২ বৎসর আগে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। ঐ প্রবন্ধে আমার বক্তব্যের মূল কথা ছিল নৃবিজ্ঞানীরা অত্যন্ত নিপুনভাবে আমাদের সমাজের ক্ষমতা কাঠামো, সম্পদ নিয়ন্ত্রন ও বন্টন এবং বর্তমানে বিরাজমান সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলো উদ্‌ঘাটন করতে পারে। (আলম ১৯৮৮ ঃ ১০৫)। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশে নৃবিজ্ঞানীদের করণীয় ৫টি কর্তব্যের (tasks) কথা বলেছিলাম যার মূল বক্তব্য ছিল সমাজের "বিভিন্ন আর্ন্তসম্পর্কগুলো বুঝা ও উদঘাটন"। এ প্রেক্ষিতে নৃবিজ্ঞানকে "বিভিন্ন সম্পর্কের" অধ্যয়ন সম্পর্কিত সামাজিক বিজ্ঞান বলেও আমি আখ্যায়িত করেছিলাম। তবে এই সম্পর্ক অধ্যয়ন একরৈখিক হবে না, আলোচনা শুধু বর্তমানে সীমাবদ্ধ রাখলেই চলবেনা বরং সম্পর্কের ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত ও বুঝতে হবে। তাই নৃবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি (approach) হবে diachronic ও synchronic উভয়ই। অর্থাৎ অতীতের আলোকেই বর্তমানের ব্যাখ্যা।

পরবর্তীতে আরও একটি প্রবন্ধে আমি বাংলাদেশে নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণার বিষয়বস্তু কি হতে পারে তার একটি বিস্তারিত ছক দেয়ার চেষ্টা করেছিলাম।ঐ প্রবন্ধে আমি উন্নয়ন, স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও লিঙ্গীয় বিষয়াবলীকে গুরুত্বপূর্ণ বলে আখ্যায়িত করেছিলাম (আলমঃ ১৯৯৬ ঃ৩০)। আবারও ১৯৯৮ সালে ভিন্ন ধরনের একটি প্রবন্ধের একাংশে আমি বাংলাদেশ চিকিৎসা নৃবিজ্ঞানের প্রয়োজন, ব্যাপ্তি ও বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। এই দুটো প্রবন্ধ লেখার পর কেউ কেউ "ডোনার-ডিব্রেন নৃবিজ্ঞান", "এনজিও-দের নৃবিজ্ঞান" ও "বাজার মুখী" নৃবিজ্ঞানের পক্ষে কথা বলছি বলে আমাকে দোষারোপ করেছেন। এতে আমি আমার বক্তব্য বা অবস্থান থেকে সরে আসিনি এবং ভবিষ্যতেও তা একই রকম থাকবে। খারাপ লাগছে এই ভেবে কারণ এ জাতীয় বক্তব্যের ধারক ও বাহকরা চাইছেন নৃবিজ্ঞানকে একটি নির্দিষ্ট পরিধির মধ্যে আবদ্ধ করতে। এ জাতীয় প্রথাগত চিন্তা বাংলাদেশে নৃবিজ্ঞান চর্চার সহায়ক নয় বলেই আমার ধারনা। আমার মতে প্রথাগত চিন্তা হল কোন একটি গন্ডির মধ্যে থেকে নিজের চিন্তাভাবনাকে প্রতিফলিত করার প্রয়াস।

বাংলাদেশে একাডেমিক নৃবিজ্ঞান চর্চার পরিধি কি হবে তা নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে। একাডেমিক নৃবিজ্ঞান চর্চার একটি অন্যতম শর্ত হল প্রতিষ্ঠানিক সংযুক্তি।

অর্থাৎ একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান ও পরিচয়। যেখান থেকে দর্শন, বিতর্ক, অবস্থান ও "লড়াই" ইত্যাদি চালিয়ে নেয়া সম্ভব হবে। বিশ্ববিদ্যালয় ও নৃবিজ্ঞান শিক্ষাদানে নিয়োজিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকেই এটা কোন কোন ক্ষেত্রে করা সম্ভব বলে মনে করি। কিন্তু সবার পক্ষে এরকম স্থায়ী একাডেমিক প্রতিষ্ঠানিক পরিচিতির সুযোগ পাওয়া কি সম্ভব? তাই বাংলাদেশে যারা একাডেমিক নৃবিজ্ঞানের তথাকথিত ধারক ও বাহক হয়ে বসে আছেন তারা এ বাস্তবতাটি বুঝতে চান না কিংবা বুঝে ও না বুঝার ভান করেন। তারা মনে করেন সবাইকেই তত্ত্ব,দর্শন, নির্মাণ, বিনির্মাণ, ও "লড়াই" এ দক্ষ হতে হবে। এর কোন বিকল্প নেই। এ জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি আমার কাছে "একাডেমিক মৌলবাদেরই" (academic fundamentalism) নামান্তর।

গত কয়েক বৎসর বিভিন্ন কাজের সুযোগে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন উপাচার্য, একজন কলেজ অধ্যক্ষ এবং বিশ্ববিদ্যায়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের কয়েকজন শিক্ষকের সাথে বাংলাদেশে নৃবিজ্ঞান শিক্ষাদান, পাঠ্যসূচী ও নৃবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে সাধারণভাবে কিছু কথা হয়।[৯] এই সকল আলোচনা থেকে কয়েকটি বিষয় বেরিয়ে এসেছে। প্রথমঃ নৃবিজ্ঞান সম্পর্কে কারও কারও ধারনা এখনও অস্পষ্ট। দ্বিতীয়তঃ বাংলাদেশে নৃবিজ্ঞান শিক্ষাদানকে আরও প্রসারিত করার প্রয়োজন আছে। তৃতীয়তঃ নৃবিজ্ঞান পড়ে শিক্ষার্থীরা বহু জায়গায় কাজের (নিয়োগের) সুযোগ পাবে। একজন কলেজ অধ্যক্ষতো বলেই ফেললেন, "নৃবিজ্ঞান খুবই যুগোপযোগী বিষয় এবং এ বিষয় পড়ে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানে কাজের সুযোগ পাবে"। কিছু দিন পূর্বে আমি ঢাকা, শাহজালাল ও জাহাঙ্গীনরগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উপর একটি জরিপ চালিয়েছিলাম। সেখানেও একটি প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষার্থীরা ফলিত বিষয়গুলোর উপর জোর দিয়ে আরও পাঠ্যসূচী তৈরীর পক্ষে মত দিয়েছিল। এখানে ও বলার অপেক্ষা রাখে না শিক্ষার্থীরা নৃবিজ্ঞান পড়ে কি করবে সেই চিন্তাই তাদের বেশী তাড়িত করছে।

তাই আগের আলোচনাতেই ফিরে যাচ্ছি প্রশ্ন রেখে আমরা নৃবিজ্ঞানের বৃহত্তর পরিধি, প্রয়োজন ও প্রয়োগের কথা ভেবেই পাঠদান ও গবেষণাকে উৎসাহিত করব না শুধু একাডেমিক নৃবিজ্ঞানকেই প্রাধান্য দেব? তা'হলে প্রশ্ন উঠতে পারে আমি কি তা'হলে একাডেমিক নৃবিজ্ঞানকে গুরুত্বহীন মনে করছি? অবশ্যই না। ১৯৮৮ সালের আমার প্রবন্ধে আবার ফিরে যেতে চাচ্ছি। এবং এ প্রসঙ্গে যা লিখেছিলাম তা নিচে বিধৃত করছিঃ

"জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের উদ্দেশ্য হল একটি বাংলাদেশী নৃবিজ্ঞানের ঐতিহ্য সৃষ্টি করা। এটা করতে গিয়ে আমাদের গুরুত্ব থাকবে প্রয়োজনমুখী দেশী নৃবিজ্ঞান (need-oriented native anthropology) যা কেমলমাত্র সমাজ

বিজ্ঞানের অন্যান্য জ্ঞানকান্ডের পরিপূরক হিসেবেই কাজ করবে না বরং সমাজের প্রত্যাশা ও পূরণ করবে" (আলম ১৯৮৮ঃ১০৭)।

এ প্রসঙ্গে আমি আরও লিখেছিলাম, "এটা গুরুত্বপূর্ণ যে প্রত্যেক সমাজবিজ্ঞানই দুটো প্রধান উদ্দেশ্য নিয়ে চর্চিত হবে। প্রথমঃ থাকবে একটি একাডেমিক উদ্দেশ্য যা হবে পাঠদান করা, প্রশিক্ষিত করা এবং সাথে সাথে নতুন প্রত্যয় ও তত্ত্ব সৃষ্টিতে অবদান রাখা। দ্বিতীয়তঃ থাকবে একটি প্রয়োগিক উদ্দেশ্য যার মাধ্যমে সমসাময়িক সমস্যা অনুধাবন না করে গুরুত্ব দিয়েছিলাম, "একটি প্রত্যয় বা তত্ত্ব সেই তত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা ও অর্ন্তনিহিত অর্থ অনুধাবন না করে গ্রহন বা বর্জন করা ঠিক হবে না। এখানে গুরুত্বপূর্ণ হলো প্রত্যেক তত্ত্ব ও প্রত্যয়ের প্রাসঙ্গিকীকরণ (contextualisation) এবং প্রায়োগীকরণ এর (operatinalisation) মাধ্যমে নতুন ভাবে এটিকে গ্রহন নতুন ধারনার জন্ম দেয়া। (পৃঃ১০৮)

আমি মনে করি, একাডেমিক ও ফলিত নৃবিজ্ঞান পরিপূরক, কোন বিচ্ছিন্ন জ্ঞানকান্ড নয়। তত্ত্ব ও প্রয়োগকে কি আলাদা করে দেখা সম্ভব? ফলিত নৃবিজ্ঞানতো জ্ঞানকেই এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সমৃদ্ধ করছে নৃবিজ্ঞানকে। প্রায়োগিক গবেষণায় সব সময়ই কি তত্ত্ব থাকতে হবে কিংবা তত্ত্ব খুঁজতে গিয়ে, সকল গবেষণাকে গুরুত্বহীন করার প্রচেষ্টা কি বাঞ্ছনীয়? সকল ফলিত গবেষণা কি দাতা-গোষ্ঠী তাড়িত? আমি মনে করি, যদিও ফলিত নৃবিজ্ঞানের বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাস নিয়ে সমালোচনা আছে, কিন্তু ইতিহাসমনস্ক হতে গিয়ে অতীত ইতিহাস দ্বারা তাড়িত হয়ে বর্তমান বাস্তবতাকে অস্বীকার করার কোন যুক্তি দেখিনা।

## নৃবিজ্ঞানে উপনিবেশবাদ

উপনিবেশবাদের সাথে নৃবিজ্ঞানের সম্পর্কের সর্বজনবিদিত ও বহুল আলোচিত। এ নিয়ে বহু লেখালেখি হয়েছে। নৃবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞানের বাইরেও এ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এ নিয়ে এখানে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। তবে নৃবিজ্ঞানের উৎপত্তির ইতিহাস আলোচনায় উপনিবেশবাদের সাথে নৃবিজ্ঞানীদের সম্পর্কের ইতিহাসকেই প্রধান্য দিয়ে উপস্থাপন করা হয়। এই সম্পর্কের গঠন, প্রেক্ষিত, প্রক্রিয়া ও ধরন স্বচ্ছভাবে তুলে ধরার প্রয়াস খুই কম কিংবা বলা চলে উপেক্ষিত। এ সম্পর্কে ক্যাথেলিন গফের একটি বহুল ব্যবহৃত উক্তি "নৃবিজ্ঞান হল সামাজ্যবাদের শিশু" আবার এ উক্তিটি এভাবে ও উপস্থাপিত করা হয়"নৃবিজ্ঞান হল সাম্রাজ্যবাদের জারজ শিশু"। এ জাতীয় উক্তি গফ কোন প্রেক্ষিতে এবং কেন করেছিলেন তা ব্যাখ্যা বা বর্ণনা না করে যদি উক্তিটিই উদ্ধৃত করা হয় তা'হলে এটাকে নৃবিজ্ঞানের ইতিহাসকে খন্ডিতভাবে উপস্থাপন নয় কি? শিক্ষার্থীরা যখন প্রশ্ন করেন যে "নৃবিজ্ঞানতো সাম্রাজ্যবাদের জারজ শিশু", এ

বিষয় পড়ে কি হবে? কিন্তু যখন প্রশ্ন করা হয় এটা কে বলেছেন, কেন বলেছেন এবং কোন প্রেক্ষিতে বলেছেন, তখন কোন উত্তর বা ব্যাখ্যা শিক্ষার্থীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে দিতে পারেনা যা আমার কাছে সমস্যার মনে হয়।

এখানে যে বিষয়টির প্রতি আমি জোর চাই তা'হল যে গফের মত এজাতীয় উদ্ধৃতি বিচ্ছিন্নভাবে ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের বিভ্রান্ত করার যৌক্তিকতা কোথায়? এতে যে শিক্ষার্থীরা বিভ্রান্ত হচ্ছে তাই নয়, নৃবিজ্ঞান বিষয়টি সম্পর্কে তাদের মনে বিরূপ ধারনার সৃষ্টি হচ্ছে যা অনেক ক্ষেত্রে হতাশার জন্ম দিচ্ছে। প্রশ্ন রাখছি এ জাতীয় অবস্থা বাংলাদেশে সুস্থ নৃবিজ্ঞান চর্চার বিকাশে কতটুকু সহায়ক?

তা'হলে আমাদের কি করার আছে? আমরা কি শিক্ষার্থীদের নৃবিজ্ঞানের সঠিক ইতিহাস জানাবো না? অবশ্যই আমরা নৃবিজ্ঞানের ইতিহাস পড়তে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করব তবে তা খন্ডিত ইতিহাস বা অর্ধ-সত্য হবে না। আমরা শিক্ষার্থীদের জ্ঞাত করব ইতিহাসের প্রেক্ষিত, কিভাবে নৃবিজ্ঞানীরা উপনিবেশ অধ্যুষিত সমাজে কাজ করেছে এবং কাজ করতে গিয়ে কিভাবে তারা নিজেদের আলাদা বা সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করেছে। যেমন বলা হয়, "যখন এথ্নোগ্রাফিক গবেষণার ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপট সরাসরি বিবেচিত হতে শুরু করেনি, তখন থেকেই অনেক নৃবিজ্ঞানী তাদের মাঠ এলাকায় উপস্থিত "অন্যান্য" পশ্চিমাদের ঔপনিবেশিক প্রশাসক, মিশনারী, বনিক থেকে নিজেদের আলাদাভাবে চিহ্নিত করার ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন।" যেমন ইভান্স-প্রিচার্ডের বেলায় এটা বলা হয়েছে যে তার আঁকা নুয়েরদের যে চিত্র,যেখানে এই সমাজে মর্যাদার পার্থক্যের গুরুত্বকে লঘু করে দেখনো হয়েছে এবং এটির প্রধানবিহীন ও 'সমতাবাদী' চরিত্রকে বড় করে দেখানো হয়েছে, তা ছিল কিছুটা কৌশলগত বিবেচনাপ্রসুত, সুদানস্থ ঔপনিবেশিক প্রশাসকদের দৃষ্টিভঙ্গিকে সামাল দেয়ার উদ্দেশ্য প্রণীত।" (ত্রিপুরা ১৯৯৯ঃ ১৬-১৭)। আরও উল্লেখ করা হয়েছে, "তার (অর্থাৎ ইভান্স-প্রিচার্ড) পেশাগত প্রজন্মের অন্য অনেক সদস্যের মত তিনিও বদ্ধপরিকর ছিলেন সনাতনী প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঔপনিবেশিক শাসকদের নিজেদের স্বার্থকে কাজে লাগানোর প্রচেষ্টাকে ঠেকানোর ব্যাপারে" (Kuklick quoted in ত্রিপুরা ১৯৯৯ ঃ ১৭)। নৃবিজ্ঞানীরা কতটুকু স্বতঃস্ফূর্তভাবে উপনিবেশিক শাসকদের দোসর হয়ে কাজ করছে আর কতটুকু তারা অবস্থার শিকার তা আমাদের স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। আমাদের সতর্ক হতে হবে যে, আমরা কিছু নৃবিজ্ঞানীরা প্রশ্নাতীত ভূমিকার জন্যে নৃবিজ্ঞান জ্ঞানকান্ডকে ঢালাওভাবে দোষারোপ করব কিনা।

## নির্মাণ ও বিনির্মাণ বিষয়

নির্মাণ (construction) ও বিনির্মাণ (deconstruction) আজ তথাকথিত উত্তর আধুনিকতাবাদীদের বহুল ব্যবহৃত রিটোরিক সব কিছুকেই নির্মাণ বা বিনির্মাণের প্রয়াস চলছে। নৃবিজ্ঞানও এর থেকে ব্যাতিক্রম নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে অবিরাম চেষ্টা চলছে নৃবিজ্ঞান জ্ঞানকান্ড যাই নির্মাণ করা হয়েছিল তা হয় আবার নির্মাণ কিংবা বিনির্মাণ করতে হবে। আপনি যদি কোন কিছুকে নির্মাণ করেন তা' হলে আবার প্রশ্ন করা হয় এটা কি বিনির্মাণ? কিন্তু এ দুটো যে আলাদা জিনিষ এটা বুঝেও না বুঝার ভান করে আবার ও বিতর্ক কিংবা বিভ্রান্তির সৃষ্টি। এই ধারনা অবস্থাকে আরও যে জটিল করছে তা নয়, নৃবিজ্ঞান চর্চায়ও আসছে অস্পষ্টতা। সমৃদ্ধ হচ্ছে না নৃবিজ্ঞান বাড়ছে বিভ্রান্তি। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শিক্ষার্থীরা। প্রশ্ন উঠছে আমরা কি করছি? কোথায় যাচ্ছি এবং আমাদের উদ্দেশ্য কি?

নির্মাণ ও বিনির্মাণের মাধ্যমে কি নির্মাণ হচ্ছে তাও স্পষ্ট নয়। নির্মাণ-বিনির্মানের বিতর্কের মাধ্যমে আমরা কি কিছু তৈরী করছি? তা'হলেও প্রশ্ন থেকে যায় এই তত্ত্বের প্রায়োগীকতা ও প্রাসঙ্গীকতা কি? কে নির্মাণ করলেন, কি নির্মাণ করলেন এবং কার জন্যে নির্মাণ করলেন সেই পুরানো প্রশ্নই এসে যায়। যারা নির্মাণ করছেন তাদের ভূমিকা ও নিরপেক্ষতার প্রশ্নও আসে। আরেকটি বিষয় যা বিবেচনার অপেক্ষা রাখে তা'হল নির্মাণ-বিনির্মাণ আলোচনায় বিরাজমান বিভিন্ন সম্পর্কের বিষয়গুলো এই সম্পর্কগুলোতেও আবার বিশেষ দল, গোষ্ঠী (বা শ্রেণীর) চিন্তা ভাবনার প্রতিফলন ঘটছে। তাই নির্মাণ-বিনির্মাণ হচ্ছে কিংবা প্রশ্ন তৈরী করা হচ্ছে কারও কারও মতাদর্শ যা ইচ্ছাকে প্রতিফলিত করার জন্যে এবং অসহীষ্ণু কিংবা আক্রমনাত্মকভাবে তা প্রচারের/গ্রহণের চেষ্টা চালানোর জন্যে কিংবা অনেকক্ষেত্রে ক্ষমতা থাকলে তা চাপ্বানোর জন্যে।

এ প্রক্রিয়ায় যেটা লক্ষণীয় তা'হল কেউ কেউ মনে করেন যে, আমার চিন্তা, ভাবনা এবং মতাদর্শ সর্বোত্তম এবং অন্য যা কিছু আছে তা বর্জনীয়। এখানে গ্রহণের বিষয়টি প্রায়শই উপেক্ষিত। এতে সৃষ্টি হচ্ছে জ্ঞান চর্চায় অস্থিরতা, অবিশ্বাস, অশ্রদ্ধা এবং অবজ্ঞা। প্রচেষ্টা থাকে সব সময় অন্যের জ্ঞানকে অবজ্ঞা করার কিংবা প্রাসঙ্গিক বা অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নে জর্জরিত করা। ভুলে যাওয়া হয় জ্ঞান কোন সময় এক এবং অভিন্ন হতে পারে না। এতে সৃষ্টি হয় চিন্তা-চেতনা ও ভাবনায় অস্থিরতা যা কোন সময় সুস্থ জ্ঞান বিকাশে সহায়ক হতে পারে না। এ প্রক্রিয়ায় কার কি করণীয় আছে তা আমাদের গভীরভাবে ভাবতে হবে।

**রাজনীতির উপস্থিতি কোথায় এবং কেন?**

আজকাল আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় তা হলে জ্ঞানকাণ্ডের প্রত্যেক পর্যায়ে অর্থাৎ পাঠ্যসূচী তৈরী, পাঠদান, গবেষণা, গবেষণার বিষয়বস্তু, মূল্যায়ন ও প্রচার প্রত্যেকটি পর্যায়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাজনীতির উপস্থিতি সম্পর্কে বলা হচ্ছে। তাছাড়া রয়েছে জ্ঞানকাণ্ড হিসেবে বিভিন্ন বিষয়ের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষিত। অর্থাৎ কোন্ প্রেক্ষিতে, কিভাবে এবং কার মাধ্যমে সামাজিক বিজ্ঞানগুলোর উৎপত্তি হয়েছিল এবং বিকাশ লাভ করেছিল তার আলোচনা। যেমন নৃবিজ্ঞানে অন্যতা (otherness) একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর এই "অন্যতা নির্মাণ" রাজনীতি নিরপেক্ষ নয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই সামাজিক বিজ্ঞান বিকাশ ও চর্চায় রাজনীতির ভূমিকা সর্বজনগৃহীত এবং সর্বজনবিদিত। কিন্তু আমার প্রশ্ন হল, রাজনীতিকে আমরা কতটুকু গুরুত্ব দেব, আবার এটিকে গুরুত্বপূর্ণ করতে গিয়ে আমরা এই রাজনীতির কতটুকু অংশীদার হব কিংবা অংশগ্রহণ করব। অর্থাৎ একটি প্রধান প্রশ্ন বর্তমান সময়ে একজন সমাজবিজ্ঞানী রাজনীতি নিরপেক্ষ হতে পারেন কিনা?

স্বীকার করি বর্তমান বাস্তবতায় সম্ভবতঃ একজন সমাজ বিজ্ঞানীর পক্ষে সম্পূর্ণভাবে রাজনীতি নিরপেক্ষ হয়ে কাজ করা সম্ভব নয়। কারণ প্রত্যেক সমাজ বিজ্ঞানী তিনি নৃবিজ্ঞানী কিংবা রাষ্ট্রবিজ্ঞানী কিংবা অর্থনীতিবিদ বা সমাজতত্ত্ববিদই হউন তিনি তার পারিপার্শ্বিক সামাজিক অর্থনৈতিক ও একাডেমিক পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত এবং লালিত হয়েছেন। কিন্তু সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় যখন কেউ কেউ তার নিজের রাজনীতিকে (কিংবা বলি মতাদর্শকে) সর্বোৎকৃষ্ট মনে করে তা প্রচার ও প্রয়োগ শুরু করে কিছু অনুসারী সৃষ্টির প্রয়াস চালায় এখানে স্পষ্ট যে দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করে তা'হলে আমার 'রাজনীতি' 'মতাদর্শ' ও 'চিন্তা-ভাবনা', অনুশীলন সর্বোত্তম।

বিশ্ববিদ্যালয় হল মুক্ত জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্র। কিন্তু জ্ঞান চর্চায় আরোপন (imposition) ও নিয়ন্ত্রণ (control) থাকবে এটা বাঞ্ছনীয় নয়। যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতে আসে তাদের প্রত্যাশা থাকে। (অন্ততঃ আমি বিশ্বাস করি) পাঠদানের থেকে তারা পরিচিত হবে বিভিন্ন মত, তত্ত্ব, ধ্যান-ধারনা বিষয়ে যা তাদের চিন্তা করতে শেখাবে এবং পরিশেষে নিজের অবস্থান ও মতাদর্শ ঠিক করতে সাহায্য করবে। কিন্তু এটা না হয়ে বহু ক্ষেত্রেই ক্ষমতাবানদের মতই আচরণ করা হয়। দেখা যায় ক্ষমতা সম্পর্কে সমতা আনবার রাজনীতিতে শিক্ষার্থীরা ক্ষমতাবানদের পক্ষে আচরণ করে।

এখানে একটি উদাহরণ প্রাসঙ্গিক হবে বলেই মনে করছি। কিছু দিন আগে এম, এস, এস পর্বের মৌখিক পরীক্ষায় একজন বহিঃ পরীক্ষক একজন শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করেছিলেন যে শিক্ষকরা কি ক্ষমতাবান? শিক্ষার্থীটির উত্তর ছিল অবশ্যই। ছাত্রীটি তার উত্তর ব্যাখ্যায় যা বলেছিলেন তা ছিল, অনেকটা এই রকম। ছাত্রছাত্রীরা সব সময়ই সজাগ থাকে কোন শিক্ষক কি চান কিংবা কোন্ মতাদর্শে বিশ্বাসী। ওরা ভাবে ক্লাশের আলোচনায় অংশগ্রহণে কি শব্দ ব্যবহার করব, কোন্ শব্দ ব্যবহার করলে শিক্ষক খুশী বা অখুশী হবেন। শিক্ষার্থীটির মন্তব্য ছিল এখানেও ক্ষমতার সম্পর্ক রয়েছে।

**শেষ কথা**

আমি এ প্রবন্ধে মোটামোটিভাবে বাংলাদেশে নৃবিজ্ঞান পাঠদান, গবেষণা ও নৃবৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রয়োগ নিয়ে গত কিছুদিন যাবত যে সকল প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল তাই আলোচনা করেছি। আমি এও যুক্তি দেখানোর চেষ্টা করেছি যে, অনেক ক্ষেত্রেই নৃবিজ্ঞান চর্চার উদ্দেশ্য ও প্রয়োগ নিয়ে অস্পষ্টতা রয়েছে যা বাংলাদেশে নৃবিজ্ঞান চর্চার বিকাশে সব সময় সহায়ক নাও হতে পারে। তবে আমার ব্যাখ্যা ও অবস্থান সবাইর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে তাও মনে করিনে। এখানে আমার একটি স্পষ্ট অবস্থানের কথা বলতে চাই। তা'হল, বাংলাদেশে নৃবিজ্ঞানকে দেখতে চাই একটি মুক্ত জ্ঞানকান্ড হিসেবে। যেখানে থাকবে বিভিন্ন মত, মতাদর্শ ও ভাবনার উপস্থিতি। প্রত্যেকেই তা, তিনি নৃবিজ্ঞানের শিক্ষার্থীই হউন আর শিক্ষকই হউন,স্বস্ব বিবেচনায় এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে যা ইচ্ছে তা গ্রহণ বা বর্জন করবেন। পারস্পরিক শ্রদ্ধা বজায় রেখে তর্ক ও বিতর্কের মাধ্যমেই সৃষ্টি হবে বাংলাদেশী নৃবিজ্ঞানের ঐতিহ্য। আর এই ঐতিহ্যে থাকবে না কোন নলেজ হেজিমনি। এটাকে যদি কেউ আমার রাজনীতি বলতে চান, তা'হলে আপত্তি নেই।

বাংলাদেশে নৃবিজ্ঞান চর্চা শুরু হয়েছে প্রায় এক দশকের উপর। এক দশক একটি জ্ঞানকান্ডের অবদান মূল্যায়নের জন্যে যথেষ্ট নয়। তবে আমার ধারণা বাংলাদেশের নৃবিজ্ঞান সঠিকভাবে এগুচ্ছে। আমি নিশ্চিত, আমরা সবাই একত্রে একটি বাংলাদেশী, নৃবিজ্ঞানের ঐতিহ্য সৃষ্টিতে সফল হব। এটা সম্ভব শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের সহকর্মীদের সহযোগীতা ও সহায়তার তাই আমাদের সবাইর একসাথে কাজ করতে হবে।

এখানে আমি একটি প্রস্তাব রাখছি। বিশ্ববিদ্যালয়ে চার-পাঁচ বৎসরে একটি ধারায় নৃবিজ্ঞানে পাঠদান করা হয়ে থাকে। কিন্তু শিক্ষার্থী জীবন শেষে বাস্তব প্রয়োজন ও

অভিজ্ঞতার আলোকে তা বিভিন্নভাবে প্রসারিত হয়। আমরা কখনও জানতে চাইনে কোন পাঠ্যসূচীর সাথে তার একমত কিংবা ভিন্নমত পোষণ করেন। কিভাবে তারা তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্জিত জ্ঞানকে কাজে লাগান। বাস্তবে নৃবিজ্ঞান চর্চায় অসুবিধেগুলো কি কি? এই বিতর্কে তাদের অংশগ্রহণ দ্বারা পরবর্তীতে হয়ত এ প্রশ্নগুলোর উত্তর পাওয়া যাবে।

## টীকা

- এই প্রবন্ধটির খসড়া আমি নৃবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞানের বাইরে বেশ কয়েকজন সহকর্মীকে পড়তে দিয়েছিলাম। তারা প্রবন্ধের বিভিন্ন বিষয়ের উপর তাদের সুচিন্তিত মন্তব্য দিয়েছেন। তাদের মূলবান মন্তব্য আমার প্রবন্ধটিকে সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করেছে। তবে প্রবন্ধের বক্তব্য একান্তই নিজস্ব এবং নৃবিজ্ঞান নিয়ে আমার ভাবনার প্রতিফলন। একজন নির্ধারিত পর্যালোচক প্রবন্ধের উপর অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কিছু মন্তব্য দিয়েছিলেন। উনার অধিকাংশ পরামর্শই আমি প্রবন্ধে প্রতিফলিত করার প্রয়াস চালিয়েছি।

১. মুক্ত আলোচনার উপর ভিত্তি করে তৈরী আইনুন নাহার ও মানস চৌধুরী সম্পাদিত "সাম্প্রতিক নৃবিজ্ঞানের ভাবনা ঃ বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক নৃবিজ্ঞানের এক যুগ" বিষয়ক দিনব্যাপী মুক্ত আলোচনার সারাংশটিতে বিভিন্ন আলোচকের বক্তব্য দেখুন। আরও দেখা যেতে পারে, সাঈদ ফেরদৌস ও মীর্জা তাসলিমা সুলতানার উপস্থাপিত প্রবন্ধ, "নৃবিজ্ঞানের প্রাতিষ্ঠানিক চর্চায় পরিবর্তন প্রবণতা", এটি নৃবিজ্ঞান বিভাগের বার্ষিক সেমিনারে পঠিত হয়েছিল, জুলাই ১৯৯৯। তাছাড়া নজরুল ইসলামের নৃবিজ্ঞান পত্রিকায় (সংখ্যা ৪, ১৯৯৯) প্রকাশিত প্রবন্ধ 'বাজারমুখী সামাজিক গবেষণা এবং নৃবিজ্ঞানীর জিজ্ঞাসা' এ জাতীয় বক্তব্যের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

২. জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের প্রথম পাঠসূচী তৈরীতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাক্তণ উপ-উপাচার্য অধ্যাপক বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর ও নৃবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক রেহনুমা আহমেদের নাম উল্লেখযোগ্য। সেই সময়ে সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ হিলারী ষ্ট্যান্ডিং ও এতে সহায়তা করেন। ডঃ ষ্ট্যান্ডিং এর বাংলাদেশ সফরের সময়ই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সাসেক্স লিঙ্ক প্রোগ্রামের চিন্তা ভাবনা শুরু হয়। যা পরবর্তীতে বৃটিশ কাউন্সিলের সহায়তায় বাস্তবায়িত হয়।

৩. পাঠ্যসূচী কোন সময় এককেন্দ্রীক বা কোন বিশেষ মতদর্শের প্রতিফলন হতে পারে না। এটা সম্মিলিত ভাবনা ও প্রয়াসের প্রতিফলন। এখানে মুক্ত আলোচনায় আইনুন নাহারের বক্তব্যটি ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ তিনি এ বিভাগের শিক্ষার্থী ছিলেন এবং পরবর্তীতে শিক্ষক হিসেবে পাঠ্যসূচী তৈরীতে তার অংশগ্রহণের কথা বলেছেন। আইনুনের বক্তব্য ছিল এরকম। "শুরুতে নৃবিজ্ঞান বিভাগের পাঠ্যসূচীতে বিভাগীয় শিক্ষকদের অবদানের পাশাপাশি বাইরের অনেকেরই অবদান ছিল। ৬/৭ বছর আগে আমি বিভাগে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেয়ার পর দেখছি, পাঠ্যসূচী তৈরীতে আমার নিজের ভেতরে চিন্তাভাবনা উৎসারিত হতে শুরু করেছে। আমরা নিজেরাই হয়তো ব্যক্তিগত দর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছি পাঠ্যসূচী তৈরী করার কাজেও লাগিয়েছি। আমার মনে হয় পাঠ্যসূচী নিয়ে এই যে তর্ক তাও একটা অর্জন (১৯১৯ পঃ ১০)।

৪. কিছু দিন পূর্বে American Anthropological Association কর্তৃক প্রকাশিত Anthropology NewsLetter এ একটি বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছিল। সেই বিতর্কের প্রধান ফোকাস ছিল "The Four Fields Approach Myth and Reality" । এই বিতর্কের এক পর্যায়ে Four vs Five এর বিষয়টি আসে। এখানে পঞ্চম উপ-বিভাগ বিষয় হিসেবে Applied Anthropology ইর কথা বলা হয়েছিল। তাছাড়া আজকাল Practicing Anthropology বিষয়টিও বেশ গুরুত্ব পাচ্ছে। তাছাড়া সাম্প্রতিককালে কিছু Introductory Anthropology বই এ Applied Anthropology কে একটি উপবিভাগ হিসেবেও আখ্যায়িত করা হচ্ছে, এবং Applied Anthropology সম্পর্কে আলোচনা থাকছে। যেমন, Anthropology : A Global Perspective, Raymond Scupin Prentice-Hall, 1998, p. 12 Emily A. Schultz and Robert H. Lavenda, Cultural Anthropology : A Perspective on the Human Condition, West Publishing Co., New York. 1990, p 10, ইত্যাদি।

৫. এখানে মার্কিন নৃবিজ্ঞানী Dr. Peter J. Bertocci, Dr. Jean Ellickson, Dr. Michael Harrison, Dr. Bert Pelto, Dr. Jim Ross এবং বৃটিশ নৃবিজ্ঞানী Dr. Paul Sillitoe, Dr. Roy Ellen, Dr. Ralph Grillo ও সমাজ বিজ্ঞানী Dr. David Lewis নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। দেশের মধ্যেও অনেকেই আমাদের পাঠ্যসূচীর প্রশংসা করেন যার পরিচয় মেলে কমিটি অব কোর্সেসের সভায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আসা নৃবিজ্ঞানীদের মন্তব্যে। তবে এখানে আমি মুক্ত আলোচনায় ডঃ আরেফিনের বক্তব্যটি উল্লেখ না করে পারছি না। তিনি বলেছিলেন, "জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস শুধু যুগোপযোগী নয়, এটা চমৎকার এ কারণে যে এটা চাত্রছাত্রী এবং আমাদের শিক্ষকদেরকে ভাবিয়েছে। এক ধরনের এনালিটিক্যাল মাইন্ড তৈরী করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।" পৃঃ ৫।

৬. জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত ১৯৯৯ সালের জুলাই অনুষ্ঠিত ২ দিন ব্যাপী সেমিনারে "প্রাসঙ্গিকতা খোঁজার" বিষয়টির উপর কয়েকজন অংশগ্রহণকারী গুরুত্ব দিয়েছেন। ডঃ হোসেন জিল্লুর রহমান, ডঃ আশরাফুল আজিজ প্রমুখ এ বিষয়টির উপর বেশ গুরুত্ব দেন। আমিও ১৯৮৮ সালের একটি লেখায় Need-oriented relevant anthropology ইর কথা বলেছিলাম। আলম (১৯৮৮), পৃঃ ১০।

৭. নৃবিজ্ঞান পড়ে শিক্ষার্থীরা নিজ সম্পর্কে ও সমাজ সম্পর্কে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরী করতে পারছে বলেই ধারণা করছি। ডঃ আরেফিন বলেছেন, "ক্রিটিকাল মাইন্ড।" তাই দেখা গেছে এই নৃবিজ্ঞান পড়েই শিক্ষার্থীরা বাজারে প্রবেশ করছে, যোগদান করছে বিভিন্ন এন,জিও, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান কিংবা আই.সি.ডি.ডি.আর, বিতে। আবার এই সকল প্রতিষ্ঠানে যেমন আই.সি.ডি.ডি.আর বি কিংবা প্রশিকাতে কাজ ছেড়ে কেউ কেউ আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিচ্ছেন। এদের পূর্বঅভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই এদের চিন্তার পরিমন্ডলকে প্রসারিত করেছে যা তাদের বিভিন্ন লেখা বা বক্তব্যে প্রকাশ পাচ্ছে। কিন্তু এটা কি সবাইর পক্ষে সম্ভব হচ্ছে? তাই যা করা হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকেই।

৮. এখানে বাংলাদেশে সমাজ বিজ্ঞান তথা নৃবিজ্ঞান চর্চায় আরেকটি উল্লেখযোগ্য সংযোজনের কথা উল্লেখ করতে চাই তা হল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে Institute of Humanities and Social Science এর আওতাধীন নৃবিজ্ঞানে উচ্চতর (এম, এস, ও পিএইচ ডি)

শিক্ষার ব্যবস্থা। এই কর্মসূচীটির রূপকার হলেন অধ্যাপক বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর। সেখানেও পাঠ্যসূচীতে শিক্ষার্থীদের কিছু প্রায়োগিক দক্ষতা অর্জনের জন্যে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। যেমন, গবেষণা শিক্ষানবিশী, কম্পিউটারে শেখা, পরিসংখ্যানের কোর্স নেয়া ইত্যাদি। শিক্ষকদের কোর্স অফারে রয়েছে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। সেখানে পড়াতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে অধ্যাপক জাহাঙ্গীর যে বিষয়টির উপর গুরুত্ব দিচ্ছেন তা'হলো "এখান থেকে পড়ে গিয়ে কেউ যাতে বসে না থাকে এবং কেউ যাতে কিছু করে খেতে পারে।" আমি মনে করি এ জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি নৃবিজ্ঞানকে এক বিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে সহায়ক হবে।

৯. এদের মধ্যে রয়েছেন চট্টগ্রাম ও শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যগণ। কলেজ পরিদর্শনে গিয়ে ঢাকার শেখ বোরহানউদ্দিন কলেজের অধ্যক্ষ জনাব কাজী ফারুক আহমদের সাথেও বিস্তারিত কথা হয়েছিল। এখানে উল্লেখ্য যে, কলেজ পর্যায়ে বাংলাদেশে শেখ বোরহানউদ্দিন কলেজেই প্রথম স্নাতক সম্মান শ্রেণীতে নৃবিজ্ঞান পাঠদান শুরু হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে রয়েছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক জেহাদুল করিম ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক ফজলে হাসান চৌধুরী। তা'ছাড়া সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যান্য জ্ঞানকান্ডের সহকর্মীদের সাথে মাঝে মধ্যে আলাপত হয়েই থাকে।

## তথ্যসূত্র


Alam, S. M. Nurul (1999), Applied Anthropology in the Next Century : Some Random Thoughts. Paper Prepared for Presentation at the International Seminar on the Role of Applied Anthropology in the 21st Century, Bangladesh Academy for Rural Development, Kotbari, Comilla, February 17, 1999.

Alam, S. M. Nurul, (1998), Teaching Health Social Science : The Case of Bangladesh. In Pilar Ramos-Jimenez and Caleste Maria V. Condor (eds.), Asia Pacific Network (APNET) of the International Forum for Social Sciences in Health. Social Development Research Center, De La Salle University, Phillipines. pp. 1-27.

Alam S. M. Nurul and Rasheda Akhter, (1996), Anthropology in Bangladesh : Past, Present and Future, Asian Studies (Government and Politics Department), Jahangirnagar University, No. 5.

Alam, S.M. Nurul, (1988), Anthropology in Bangladesh : World Context, Main Issues, Concerns and Priorities. The Jahangirnagar Review, Part II Social Science, Vols. XI & XII, 1986-88, pp. 93-110.

Epstein, Scarlett T, (1985), Thoughts on the Future of British Social Anthropology. Human Organization, Vol. 44, No. 2, pp. 187-188.

প্রশান্ত ত্রিপুরা (১৯৯৯) ইতিহাসের মুখোমুখি ঃ নৃবিজ্ঞানের উত্তর-ঔপনিবেশিক সংকট। নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা-৪, পৃঃ ১১-২৪।

সাঈদ ফেরদৌস ও মীর্জা তাসলিমা সুলতানা, নৃবিজ্ঞানের প্রাতিষ্ঠানিক চর্চায় পরিবর্তন প্রবণতা। নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সেমিনারে উপস্থাপিত, ঢাকা জুলাই, ১৯৯৯।